পালিভাষা ও সাহিত্য

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া

'পালি' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। এই গবেষণার ধারা এতই বিক্ষিপ্ত যে উহার মধ্য হইতে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা কষ্টকর।

সংস্কৃতের ন্যায় 'পালি' শব্দেরও অর্থ 'পংক্তি' বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "পঙ্‌ক্তি বীথ্যাবলিশ্রেনি পালি রেখা তু রাজি চ।"[১] আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন[২] ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী[৩] মহাশয় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই কি করিয়া সংস্কৃত 'পঙ্‌তি' শব্দ থেকে পালি শব্দের উৎপত্তি হইল তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। সংস্কৃত পঙ্‌তি বলিতে আমরা পদের শেষ চরণ বুঝি। "তথাচ সূত্র পঙ্‌তি"। মূল গ্রন্থ বুঝাইতেও 'পঙ্‌তি' শব্দের প্রয়োগ হয়। "পিটকওয়ং পালিঞ্চ তস্‌স অট্‌ঠে কথঞ্চ তং"; "এবং পালিয়ং বুত্তনয়েন"। —এইরূপ পালিতে বা মূলে! এই রকম বহু উদাহরণ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়।

পালিতে 'তন্তি' শব্দ পালি শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'তন্ত্র' 'তন্ত্রি' অথবা 'তন্ত্রী' শব্দ মূলত একই। অধ্যাপক ভি. আপ্তে পালি শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'তন্ত্র'।

ক্রমে ক্রমে পালিতে রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই নাম মূল পালি ভাষা বলিয়া কথিত হয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধের বাণী ও ধর্মোপদেশ যে ভাষায় রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাকেই পালি ভাষা বলে। অথবা ভগবান বুদ্ধের উপদেশ এই ভাষাতে পাঠ ও রক্ষিত এই অর্থে পালি।[৪] পাঠ > পাল > পালি। পালি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে "সদ্দত্থং পালেতীতি পালি।" — যাহা শব্দার্থকে পালন করে অথবা রক্ষা করে তাহার নাম পালি।

'পল্লী'র ভাষা পালি ভাষা। পল্লী হইতে পালি হইয়াছে। 'পল্লী' বা পাড়াগাঁ'র ভাষা পালি — এই সম্বন্ধে কোন যুক্তি সংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ কেবল মাগধী প্রাকৃতেই 'র' পরিবর্তিত হইয়া 'ল' হয়। পালিতে ইহা খুব বিরল। সুতরাং উক্ত মত সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বৌদ্ধ-বিদ্বেষী পণ্ডিতদের অপপ্রচার।

আবার কাহারও মতে মগধ বা পাটলিপুত্রের নামানুসারে পালি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পাটলি শব্দের অপভ্রংশ পালি হইতে পারে না। পল্লী বা পাড়াগাঁর ভাষা পালিভাষা এবং পল্লী হইতে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে 'পল্লী' বলিতে আমাদের আধুনিক গ্রাম বলিলে ভুল হইবে। গ্রামেরই বিশেষ অংশকে পল্লী বলা হয়। পালি কখনও একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ভাষা হইতে পারেনা। পালি গ্রাম ও নগর উভয়েরই ভাষা। এই ভাষা প্রথমতঃ কথ্য ভাষা হইলেও, পরে পরে সাহিত্যের রূপ পাইয়া পুরাপুরি লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। সিংহল, বার্মা, শ্যাম, এবং কম্বোডিয়ার পালি পণ্ডিতেরা পালিকে "মাগধী নিরুক্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ যে-দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের নাম মগধ বা পাটলীপুত্র। তিনি যে-ভাষায় কথা বলিতেন এবং ধর্মপ্রচার করিতেন উহার নাম পালি বা মাগধী। এই দুই ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন ভেদ নাই। সিংহলী পণ্ডিতেরা শুধু ইহাতে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত পণ্ডিতদের মত পালিকে দেব ভাষা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই ভাষায় প্রথম আদি কল্পের মানুষেরা কথা বলিতেন। স্বর্গের দেবতা ও অরণ্যে নিক্ষিপ্ত মানব শিশু এই ভাষায় কথা বলিতেন। সিংহলী পণ্ডিতদের মতানুসারে পালি ভাষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে:

" সামাগধী মূল ভাষা নরায় আদিকপ্পিকা,
ব্রাহ্মণো চ সস্সুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ইতিভাসরে।"

"মাগধী ভাষা আদি কল্পের মানবের মূলভাষা। সে অশ্রুতপূর্ব ভাষায় মহাব্রহ্মা ও বুদ্ধ কথা বলিতেন।"

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃত মাগধী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ পালিকে ইহার সহিত তুলনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু পালি ও বৌদ্ধ মাগধী পরস্পর ভিন্ন। কারণ বৌদ্ধ মাগধীতে কেবল 'স'-এর ব্যবহার আছে। অপরপক্ষে প্রাকৃত মাগধীতে 'শ'-এর ব্যবহার বর্তমান। পালিতে কচিৎ 'র' 'ল' হয়। প্রাকৃত মাগধীতে সর্বদাই 'র' 'ল'-এ পরিণত হয়।

যথা — বিলাশ = বিলাস ; মাশ = মাস।

রাজা = লাজা ; রক্ত = লত্ত। নির্ঝর = নিজ্বল।

প্রাকৃত মাগধীতে 'অ' কারান্ত পুলিঙ্গ শব্দে প্রথমার একবচনে 'এ' হয় ; পালিতে 'ও' হয়। যথা ঃ— মাসো = মাশে ; বিলাসো > বিলাশে প্রাকৃত মাগধীতে অস্‌মদ্ শব্দের প্রথমার এক ও বহুবচনে 'হকে' ও 'হগে' পদ হইয়া থাকে। যথা ঃ "চেড়ে হগে" > "চেটঃ অহং > (বৌদ্ধ মাগধীতে) চেটো অহং"।

প্রাকৃত মাগধীতে অবর্ণান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিকল্পে 'আহ' হয়। যথা ঃ 'পুলিশাহ' অথবা 'পুলিশশ্‌শ > পুরিষস্য। বৌদ্ধ মাগধীতে ইহার রূপ পুরিস্‌স। যথা ঃ "হগে ন এলিশাহ কম্মা হ কালী" = 'অহং ন এতাদৃশস্য কর্মং কারী।' উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মাগধী প্রাকৃত ও পালিতে কোন মিল নাই। ধ্বনিতত্ত্ব, ভাষা ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও ভাষা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

। পালি ভাষার ভৌগোলিক সংস্থান ।

পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল বা ভৌগোলিক অবস্থান লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিজেদের দৃষ্টি কোণ হইতে এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই ভাষা কিছুতেই সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত (খ্রীষ্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতাব্দীতে) মাগধী নিরুক্তি বা নিম্ন স্তরের লোকের ব্যবহৃত ভাষা নয়। ইহা বৈদিক আর্য ভাষার মতই দেব ভাষা। সেই হিসাবে ইহাকে 'তন্ত্র ভাষা' বা 'তন্তি ভাষা' বলা যায়। কারণ এই পালি ভাষাতেই 'বৌদ্ধ শাস্ত্র' বা 'বৌদ্ধ তন্ত্র' সমস্ত এশিয়াতেই প্রচারিত হইয়াছিল। দীর্ঘ ২৫০০ (আড়াই হাজার) বৎসর ধরিয়া এখনও এই পালি ভাষায় সিংহল, বার্মা, শ্যাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত দেশের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃত সমস্তই পালি সাহিত্যের অনুকরণে রচিত। ঐ সমস্ত দেশের ভাষা ও সংস্কৃত অনুধাবন করিলে যে-কোন লোকই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন পশ্চিম ভারতের কোন একটি ভাষা থেকে এই পালি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে পূর্ব-ভারতীয় কোন ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। আবার কেহ মধ্যভারতীয় কোন ভাষাও পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অভিমতগুলি পৃথক পৃথক ভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

ক. ওল্‌ডেনবার্গ ও ই. মূলার বলেন যে ইহা কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার ভাষা। কারণ উদয়গিরিতে প্রাপ্ত খারবেলের শিলালিপির ভাষারও এই পালি ভাষার সঙ্গে বেশ মিল আছে। তাঁহারা বলেন মহিন্দ সিংহলে যাওয়ার বহু আগেই উড়িষ্যায় পালি ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়াছিল। উড়িষ্যার বণিকেরা কলিঙ্গ অঞ্চলের বন্দর সমূহ হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ যোগে বিভিন্ন দেশে পণ্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত। সেই সঙ্গে পালি ভাষা ও পাক-ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাজেই এতদ্‌ অঞ্চলের ভাষা পালি ভাষার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।

খ. জার্মান পণ্ডিত ওয়েষ্টার গার্ড এবং খুন বলিয়াছেন যে উজ্জয়িনী বা অবন্তী অঞ্চলের কোন ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা দেখাইয়াছেন মহারাজ অশোকের শিলালিপির সহিত (Girner Version) পালির মিল আছে। ইহা ছাড়াও মহাপণ্ডিত বুদ্ধঘোষ তাঁহার অর্থকথাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে অশোকের ছেলে কুমার মহিন্দ বিদিসা রাণীর গর্ভে উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষু হইয়া এই উজ্জয়িনী থেকেই বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। কাজে কাজেই পালি উজ্জয়িনীর ভাষা।[৫] আরেকজন জার্মান পণ্ডিত অটো ফ্রাঙ্কের মতে পালি উজ্জয়িনীর কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষা। কারণ এতদ্‌ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকৃত শিলালিপির ভাষার সহিত পালির সম্পর্ক নিকটতর।

গ. ডক্টর সুকুমার সেন বলেন পালি ভাষা 'দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্য মধ্যমার মিশ্রণে গড়া।' ইহা পুরাপুরি ধর্মসাহিত্যের ভাষা। তাঁহার মতে ভাষাতত্ত্বের বিচারে দিল্লী অঞ্চলের ভাষার সহিত পালির মিল অত্যধিক। 'র' কার 'ল' কারে, বিসর্গ মুক্ত 'অ' কারান্ত পদ 'এ' কারে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দক্ষিণ পশ্চিমার মত পালিতে আত্মনে পদে বেশী।

ঘ. ষ্টেন কনো'র মতে পালি ভাষা বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কারণ বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রচলিত পৈশাচী প্রাকৃতের সহিত পালি ভাষার মিল অত্যধিক। ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এবং গ্রীয়ার্স'ন পালির সহিত পৈশাচী প্রাকৃতের সাদৃশ দেখাইয়াছেন।

ঙ. পণ্ডিত গ্রীয়ার্স'ন ও জার্মান পণ্ডিত উইণ্ডিচ[৬]-এর মতে পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল কান্দাহার। গ্রীয়ার্স'ন মনে করেন পালি ভাষা একটি মিশ্রভাষা এবং বিশেষ করিয়া তক্ষশিলা অঞ্চলেই ইহার আলোচনা ও চর্চা বেশী হইয়াছিল।[৭] মাগধীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হইয়াই পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।

ইহা ছাড়াও গাইসার, উইণ্টারনিট্‌চ, চাইল্ডার, রিস্‌, ডেবিড্‌স এবং ডক্টর বড়ুয়া প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন যে পালির উৎপত্তির জন্মসূত্র মাগধী থেকেই খুঁজিতে হইবে। এই মাগধী কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভাষা নয়। প্রাচীনকালে সমস্ত উত্তর ভারত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজে কাজেই এই পালিভাষা বা মাগধী সমস্ত উত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা Lingua Franca ছিল। এই ভাষাতেই সাধারণ লোক তাঁহাদের ভাব বিনিময় করিতেন। এই সাধারণের ভাষায়ই ত্রিপিটক লিখিত হইয়াছিল। ইহাই পালিভাষা। ইহা ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্রে বা মগধে প্রচলিত ছিল।

সিলভেন ও হেরমন লুডার্‌স অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পালিভাষায় বস্তুতঃ ত্রিপিটক সংকলিত হয় নাই। প্রথমতঃ ত্রিপিটক সংকলিত হইয়াছিল প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ভাষায়। ঐ ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ পাওয়া যাইবে অশোকলিপির ভাষায়।[৮] অশোকলিপির ভাষা যদিও পালির সঙ্গে এক নয় তথাপি অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে পালি ত্রিপিটক

প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষায় সংকলিত হইয়াছিল। পরে পালিভাষায় তর্জমা করা হয়।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিনয় পিটকে উক্ত "সফায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া পুনিতং" [৭] বচনটি গভীর তাৎপর্য পূর্ণ। বুদ্ধের অনুমতি পাইয়া ভিক্ষুরা নবোৎসাহে বুদ্ধশাস্ত্র নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধবচন (১) পালি (২) বৌদ্ধ সংস্কৃত (৩) সংস্কৃত এবং (৪) পশ্চিম ও পূর্ব দেশীয় প্রাকৃত ভাষায় অনুদিত হয়। পালি গ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে মহাকাত্যায়ন ও পুন্নমন্তানিপুত্ত নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে বৌদ্ধধর্ম ও পালিভাষা চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই সময় উজ্জয়িনীর ভাষাই মধ্য দেশীয় ভাষা হিসাবে পরিগণিত হইত। সুনীতিবাবুর মতে যে-সমস্ত ভাষায় প্রাচ্য দেশীয় প্রাকৃত হইতে বুদ্ধবচন অনুদিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে এই মধ্যদেশীয় প্রাকৃত অন্যতম। এই মধ্যদেশীয় প্রাকৃত সৌরসেনী নামে খ্যাত। এই সৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সম্পর্ক খুব বেশী। এই সৌরসেনী হইতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয়। বেশ কিছু ভারতীয় পণ্ডিত সুনীতিবাবুর এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা সুদূর প্রসারী। এই ভাষা এককালে সমগ্র উত্তর ভারতের কথ্য ভাষা নয়, লিখিত ভাষায়ও পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উপরি উক্ত পণ্ডিতদের কাহারও মতই পুরাপুরি সত্য নয়। কারণ তাঁহারা সবাই ভাষাতত্ত্বকেই প্রধানরূপে ধরিয়া পালিভাষার জন্মসূত্র খুঁজিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা মানব জীবনের প্রধান অঙ্গ। ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহিত মানবেতিহাসের উত্থান-পতন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার সহিত সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক বিভাগের কথা চিন্তা করিতে হয়।

সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান বুদ্ধ কোশলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ও মধ্য-ভারত পরিভ্রমণ করেন। পাক-ভারতের বিচিত্র সমাজ, অর্থনীতি,

রাজনীতি, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সর্বতোভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা, চাপালচৈত্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। এই বিহারগুলি শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল নয়, ইহা বৌদ্ধ-শাস্ত্র চর্চা ও ভারতীয় সংস্কৃতিরও মিলন কেন্দ্র ছিল। এইখানে থাকিয়া বৌদ্ধ শ্রমণেরা বিবিধ শাস্ত্র (বহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ) অধ্যয়ন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারী আসিয়া এখানে ভীড় করিতেন। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডি ত্যাগ করিয়া মঠের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। দীর্ঘদিন মঠে বাস করার পর তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলা অসুবিধা বোধ করিতেন। তাহাছাড়া যাতায়াতের কিছুটা অসুবিধা থাকায় অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ততটা সুযোগও ছিল না। কাজে কাজেই কালক্রমে নিজেদের মধ্যে সহজে ভাব বিনিময়ের একটা মিশ্র নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই পালি ভাষা। এই ভাষায় বিহারে পাক্ষিক ধর্মালোচনা ও প্রাতিমোক্ষ সূত্র আবৃত্তি হইত। এই ধর্ম সভায় ভিক্ষুদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। এই কারণেই সাধারণ ভিক্ষুদের বুঝিবার জন্য একটা সর্বজন বোধ্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। তাই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই বিহারগুলিতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয় এবং এই ভাষাতেই বৌদ্ধ-শাস্ত্র ও ত্রিপিটক গ্রন্থ রচনা ও সংরক্ষিত হইয়াছিল।

অতএব আমরা দেখিতে পাই ভগবান তথাগত মাগধীভাষায় তাঁহার উপদেশাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা এই মাগধী প্রাকৃতকে কেন্দ্র করিয়া পালিভাষা নামে এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত তৎকালীন প্রায় সমস্ত ভাষার শব্দ-সম্ভারে এই নূতন পালি ভাষা পুষ্ট ও বর্ধিত। সুতরাং পালি কেবলমাত্র পল্লীর ভাষা ইহা গ্রহণ যোগ্য নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পর যোগাযোগে সৃষ্ট ইহা এক সঙ্কর ভাষা। কথিত আছে এই ভাষায়ই ভগবান তথাগত তাঁহার নব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

| পালি সাহিত্য |

পালি সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। মূল পালি বা ত্রিপিটক এবং অর্থকথা বা ভাষ্য। মূল পালি সাহিত্যকে ত্রিপিটক বলে। কারণ মূল বুদ্ধবচনগুলি তিনটি পেটিকা বা ভাঁজে বিভক্ত। উহাদের নাম (১) সূত্র (২) বিনয় এবং (৩) অভিধর্ম।

মূল ত্রিপিটক ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে সংগৃহীত হইয়াছিল।[১০] এই মহাসঙ্গীতি রাজগৃহের নিকটস্থ সপ্তপর্ণি গুহাতে মহারাজ অজাত শত্রুর অর্থানুকূল্যে সংগঠিত হইয়াছিল। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন মহাপণ্ডিত মহাকাশ্যপ স্থবির। এইভাবে ত্রিপিটেকের রচনাকাল দাঁড়ায় খ্রীস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে এই রচনাকাল নিয়া অনেক প্রকার মতদ্বৈত আছে। ওল্ডেনবার্গ এই সঙ্গায়নের অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে প্রথম সঙ্গীতি সংগঠিত হওয়ার কারণ মহাপরিনির্বাণ সূত্রে[১১] যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। মোটামুটি আমরা যাহা উপলব্ধি করি তাহাতে বুঝা যায় যে রাজগৃহের সঙ্গীতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলেও ইহা সর্বজন বিদিত যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে তাঁহার বাণী সঠিকভাবে সংরক্ষণের তাগিদ তদানীন্তন ভিক্ষুসংঘ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজগৃহে একটা বড় ধরণের উপোসথ সভা আহুত হইয়াছিল। ঐ সভাতে বুদ্ধ বচন মোটামুটি সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু থেরবাদী বৌদ্ধেরা সবাই একমত যে বুদ্ধের মহাপরিনর্বাণের অব্যবহিত পরেই প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং ঐ সভাতে সমস্ত ত্রিপিটক গ্রন্থ সংকলিত হয়।

এই সঙ্গীতির এক শত বৎসর পরে আবার বৈশালীতে মহারাজ কালাশোকের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতি আহুত হওয়ার কারণ হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে কতকগুলি "খুদ্দকানুখুদ্দ সিক্খাপদ"[১২] নিয়া বিভিন্ন মতামতের সৃষ্টি। কোন কোন ভিক্ষু কতিপয় বিনয় সংঘটিত

আচরণের অপব্যাখ্যা করেন। তাহাতে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা বিনয়ের বিশুদ্ধি রক্ষণে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাহারই ফলে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সভাতে সভাপতিত্ব করেন সব্বকামী স্থবির। দুই পক্ষের সম্মতিতে সাত শত অরহৎ ভিক্ষু এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় বর্জী ভিক্ষুগণের আচরিত 'দশবত্থুনি' বা দশটি বিনয়ের নীতি বিনয় বহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কিন্তু উহাতেই বিবাদের পুরাপুরি মীমাংসা হয় নাই। কতিপয় ভিক্ষুদের মধ্যে এই অসন্তোষের ভাব আরও একশ বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে।

এই শতাব্দী-ব্যাপী বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিবার জন্য আবার খ্রীঃ পূঃ ২২৭ অব্দে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। উহার প্রধান উদ্যোক্তা সম্রাট অশোক স্বয়ং। তিনি নিগ্রোধ শ্রামনের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হওয়ার পরে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য তাঁহার বিশাল রাজ-শক্তি নিয়োগ করেন। কথিত আছে তিনি ৯৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যে ৮৪০০০ বৌদ্ধ বিহারও মঠ নির্মাণ করাইয়া তাহাদের রক্ষাণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত তীর্থস্থান সমূহ স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া প্রতিটি স্থানে স্তূপ নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত বহু স্তূপ ও শিলালিপি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি গুলি শুধু পাক ভারত উপমহাদেশে নয় সমস্ত ইতিহাসে গৌরবের স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আচরণ বিধির মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহার গুরু মোগগলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে পাটলিপুত্রে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় এক হাজার ভিক্ষু সংঘায়নে অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু হাজার ভিক্ষু তথায় উপস্থিত থাকিয়া সভার সিদ্ধান্ত মানিয়া নিয়াছিলেন। এই সভায় বিপক্ষী ভিক্ষুদের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা নিয়া মোগগলিপুত্ত স্থবির কথাবত্থু নামক একটি নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। উহা অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত হয়। কথিত আছে তিষ্য মোগগলিপুত্ত সমস্ত বিধর্মী ভিক্ষুদিগকে ধর্মীয় বাক্‌বিতণ্ডায় সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অশোক অভিক্ষুদিগকে শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া বিহার হইতে বাহির করিয়া দেন। এই সভায় সমস্ত ত্রিপিটক পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পঠিত হয়। আমরা বর্তমানে যে আকারে ত্রিপিটক পাইতেছি তাহা

ঐ তৃতীয় সঙ্গীতির ফল। এই মহাসঙ্গীতির অব্যবহিত পরেই সম্রাট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে প্রচারক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে কেবলমাত্র সূত্র ও বিনয় (ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ) পিটকের উল্লেখ দেখিতে পাই। কেবল তৃতীয় সঙ্গীতিতে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক অর্থাৎ সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে খুব সম্ভবতঃ অভিধর্ম পিটক ধর্ম বা সূত্র পিটকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয় সঙ্গীতিকারকগণ অভিধর্ম পিটককে সম্পূর্ণ পৃথক একটা ভাগে বিভক্ত করেন। কথিত আছে প্রথম সঙ্গীতিতে আনন্দ স্থবির সূত্র ও অভিধর্ম এবং উপালি স্থবির বিনয় পিটক আবৃত্তি করেন। সর্বপ্রথম সঙ্গীতিকারকেরা বিনয় পিটক সংগ্রহ করেন। কারণ বিনয় অন্য দুই পিটকের চেয়ে বেশী দরকারী। অর্থকথাকারগণ বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "বিনয় নাম বুদ্ধ সাসনস্স আয়ু" অন্য দুই পিটক লুপ্ত হইয়া গেলেও বিনয় পিটক বর্তমান থাকিলে ভিক্ষুসংঘ পরিশুদ্ধ থাকিতে পারিবে। ভিক্ষুসংঘ বর্তমান থাকিলে তাঁহারা আবার ক্রমে নিজেদের চেষ্টায় বুদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। ভিক্ষুদের বা বৌদ্ধ শাসনের পরিশুদ্ধির জন্য বিনয় পিটক একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিনয়কে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সুত্তবিভঙ্গ — পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া (২) খন্দক — মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ এবং (৩) পরিবার বা পরিবার পাঠ। সুত্তবিভঙ্গ — বিনয়ের শিক্ষাপদগুলি কোথায় কি ভাবে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির বিবরণ সুত্তবিভঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। সুত্তবিভঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত; ভিক্ষু বিভঙ্গ এবং ভিক্ষুণী বিভঙ্গ। মহাবিভঙ্গের মধ্যে ভিক্ষুদের শীল সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ভিক্ষুদের শীল সমূহ আট ভাগে বিভক্ত। পারাজিকা, সংঘাদিশেষ, নিয়ত ও অনিয়ত, নিস্‌সগিগয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেশনিয়া, সেখিয়া ও অধিকরণ সমথ। কেবল এই নীতিগুলি সংকলন করিয়া একটি ছোট বই করা হইয়াছে উহাকে পাতিমোকখ বলে। এই আট প্রকার নীতি ও নীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা মহাবিভঙ্গের মধ্যে পাওয়া যাইবে। ভিক্ষুণী বিভঙ্গ অনুপাতে ছোট এবং ইহার মধ্যে একটা অধ্যায় কম। উভয় বিভঙ্গে নীতিগুলি লঘু ও গুরু আনুক্রমিক ভাবে সাজানো।

খন্দকস — ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ঃ মহাবগগ ও চুল্লবগগ। এই দুইটা সুত্তবিভঙ্গের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। মহাবগ্‌গে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক মাসের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। মহাবগগ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কি করে বুদ্ধ পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের কাছে প্রথম 'চতুরার্য সত্য' দেশনা করিয়াছেন. বিহার প্রতিষ্ঠা, বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন, উপোসথ পালন, দীক্ষা গ্রহণের নিয়ম পদ্ধতি, খাদ্য, বাসস্থান, ঔষধ পথ্য সংগ্রহের প্রণালী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্‌সঙ্গে তদানীন্তন ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীরও কিছুটা আভাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

চুল্লবগ্‌গের প্রকৃত অর্থ ছোট নয়। ইহা আকারে মহাবর্গের চেয়েও বড়। ইহাতে মোট ১২টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে স্মারক গাথা আছে। ইহাতে বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও সংঘের গঠন ও পরিচালন বিষয়ক বহু ঘটনার সমাবেশে ভরপুর। নবম অধ্যায়ে ভিক্ষুদের এবং দশম অধ্যায়ে ভিক্ষুণীদের শীল সমূহের ব্যাখ্যা আছে। প্রথমটাতে ভিক্ষুদের বিবাদ ও তাহার সূক্ষ্ম বিচার, শাস্তি বিধান, পরিবাস ও দৈনন্দিন জীবন, বাসস্থান এবং আসবাবপত্রের কথা আছে। দশম অধ্যায়ে ভিক্ষুণীদের অষ্টগুরুধর্মের ব্যাখ্যা আছে। একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথম সঙ্গীতি ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণ আছে। এই কারণেই এই দুই অধ্যায়কে পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

পরিবার পাঠো — এই গ্রন্থটি সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের রচনা। পণ্ডিতগণ ইহা সিংহলে সংকলিত হয় বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতে ১৯টি অধ্যায় আছে। ইহাতে মোটামুটি বিনয়ের শীল সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

সুত্তপিটক — ইহা প্রথমতঃ পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত ঃ (১) দীঘনিকায়, (২) মজ্ঝিম নিকায় (৩) সংযুত্ত নিকায় (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় (৫) খুদ্দক নিকায় সুত্তপিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় চতুরার্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম,[১৩] পঞ্চোপাদান স্কন্ধ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, প্রতীত্য সমুদ্‌পাদ ইত্যাদি। সেই বিষয়গুলি বেশী কম সমস্ত নিকায়ে পাওয়া যায়। দীঘ নিকায়ের সূত্রগুলি আকারে দীর্ঘ। ইহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত পুরানো। ইহাতে ৩৫টি সূত্র আছে। কতিপয় সূত্রে প্রাকৃতের প্রাধান্য বেশী। মজ্ঝিম

নিকায়ের সূত্রগুলি আকারে এত বেশী দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ নিকায়ে প্রাক্-বৌদ্ধ দর্শনের প্রাধান্য হইলে মজ্ঝিমনিকায়ে বৌদ্ধ দর্শনের গূঢ়তম রহস্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সংযুক্ত নিকায় ৫টি বর্গে বিভক্ত। যথাঃ সগাথা, নন্দন, খন্ধ, সলায়তন এবং মহাবর্গ এই সূত্রসমূহের বিষয়বস্তু শীল মনস্তত্ত্ব, ও দার্শনিক প্রশ্ন।

ইহাতে বহু উচ্চ ধরণের সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য, কথোপকথন, গল্প, ছোট গল্প, ও প্রবচন সংগ্রহ আছে। বেশীর ভাগ আলোচনা, নিদান, ধ্যান, সত্য, স্ত্রীচরিত্র, ব্রহ্মা ও দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়। সচ্চসংযুক্তে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের উল্লেখ আছে। নিদান সংযুক্ত প্রতীত্য সমুদ্পাদ বা জন্মমৃত্যু রহস্য নিয়া গবেষণা আছে। ইহাতে বহু নূতন বিষয়ের আলোচনা আছে যাহা ত্রিপিটকের অন্য কোথাও বিরল। যেমন বোধি-পক্ষীয় ধর্মের বিস্তৃত আলোচনা ইহার মত আর কোথাও নাই। বহু প্রকার দেবতা, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্বের বিস্তৃত আলোচনায় এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের বিষয়বস্তু দীর্ঘ ও মজ্ঝিম নিকায় হইতে নেওয়া হইয়াছে। এখানে সেখানে পূর্ব দুই নিকায়ে উল্লেখিত বিষয় সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও এই নিকায়ে স্বর্গ, নরক, স্ত্রীচরিত্র, বুদ্ধের বিবিধ গুণ, উপাসক উপাসিকাদের কর্তব্যাকর্তব্য এবং সর্বোপরি পাক-ভারতের ইতিকাহিনীর বহু দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা (ঙ) পঞ্চবল — শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতিসমাধি ও প্রজ্ঞা। (চ) সপ্তবোধ্যঙ্গ — স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা। (ছ) অষ্টমার্গাঙ্গ — সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, ও সম্যক-সমাধি। তবে কিনা চিত ও চৈতসিক হিসাবে বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যা চৌদ্দ। এই চৌদ্দটির মধ্যে বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতে উহারা সপ্তত্রিংশতে গিয়া দাঁড়ায়।

সংক্ষেপে দীর্ঘনিকায়ে প্রাক্-বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক রীতিনীতি নিয়া আলোচনা ও গবেষণা করা হইয়াছে।

ইহাতে দর্শন অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মজ্ঝিম নিকায় সমস্ত নিকায়ের মধ্যে প্রধান। কারণ ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় শীল ও বৌদ্ধ দর্শন। ইহা দীর্ঘনিকায়ের মত প্রাক্-বৌদ্ধ দর্শন নিয়া অতবেশী মাথা ঘামায় নাই। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায় দীর্ঘ, মজ্ঝিম নিকায় সমূহের বিস্তৃত ভাষ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

খুদ্দকনিকায় —খুদ্দকনিকায়ের অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট নয়। 'খুদ্দক' অর্থে আমাদের এখানে বুঝিতে হইবে অনেকগুলি গ্রন্থের সমষ্টি। খুদ্দকনিকায় অন্যান্য নিকায়ের চেয়ে আকারে বড়। কারণ ইহাতে ছোট-বড় ১৬টি গ্রন্থ আছে। যথা ঃ খুদ্দকপাঠো, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিবমানবর্থ, পেতবত্থু, থের-থেরীগাথা, জাতক, উদ্দেশ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক, নিদ্দেশ ও পটিসম্ভিদামার্গ। ইহার মধ্যে ধর্মপদ, জাতক ও সুত্তনিপাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ বইগুলিতে প্রাচীন পাক-ভারতের বহু তত্ত্ব ও তথ্য নানাভাবে রক্ষিত আছে। থেরীগাথাতে প্রাচীন ভারতে মহিলা সম্প্রদায়ের বহু তথ্য নিহিত আছে। মহিলা সমাজের অপরূপ কাহিনী অন্য কোন গ্রন্থে এতবেশী পাওয়া যায় না।

অভিধর্মপিটক — আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি প্রথম দুই সঙ্গীতিতে অভিধর্মপিটকের কোন উল্লেখ নাই। অভিধর্মপিটকের রচনাকাল নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। ইহাতে ৭টি গ্রন্থ। যথা ঃ ধর্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, যমক, পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, ধাতুকথা, পটঠান ও কথাবত্থু প্রকরণ। ইহার মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ কথাবত্থু প্রকরণ নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ এই গ্রন্থটির রচনা হয় তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে তিস্‌স মোগগলিপুত্ত কর্তৃক। অথচ ইহা ত্রিপিটকের অন্তর্গত করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে ইহাতে নূতন কিছু যোগ করা হয় নাই। মূল ত্রিপিটকে যাহা ছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নয়। এই গ্রন্থটির এমন কতগুলি বিষয় আছে যাহা কিছুতেই অশোকের সমসাময়িক নয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই গ্রন্থের কিছুটা অংশ অশোকের সমসাময়িক, বাকী অংশ অশোকের পরে রচনা করিয়া মূল গ্রন্থের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেই অংশে 'শৈল,' 'বৈটুল্লক,' 'সঙ্কন্তিক,'

নিকায়ের সূত্রগুলি আকারে এত বেশী দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ নিকায়ে প্রাক্-বৌদ্ধ দর্শনের প্রাধান্য হইলে মজ্ঝিমনিকায়ে বৌদ্ধ দর্শনের গূঢ়তম রহস্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সংযুক্ত নিকায় ৫টি বর্গে বিভক্ত। যথাঃ সগাথা, নন্দন, খন্ধ, সলায়তন এবং মহাবর্গ এই সূত্রসমূহের বিষয়বস্তু শীল মনস্তত্ত্ব, ও দার্শনিক প্রশ্ন।

ইহাতে বহু উচ্চ ধরণের সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য, কথোপকথন, গল্প, ছোট গল্প, ও প্রবচন সংগ্রহ আছে। বেশীর ভাগ আলোচনা, নিদান, ধ্যান, সত্য, স্ত্রীচরিত্র, ব্রহ্মা ও দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়। সচ্চসংযুক্তে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের উল্লেখ আছে। নিদান সংযুক্ত প্রতীত্য সমুদ্পাদ বা জন্মমৃত্যু রহস্য নিয়া গবেষণা আছে। ইহাতে বহু নূতন বিষয়ের আলোচনা আছে যাহা ত্রিপিটকের অন্য কোথাও বিরল। যেমন বোধি-পক্ষীয় ধর্মের বিস্তৃত আলোচনা ইহার মত আর কোথাও নাই। বহু প্রকার দেবতা, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্বের বিস্তৃত আলোচনায় এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের বিষয়বস্তু দীর্ঘ ও মজ্ঝিম নিকায় হইতে নেওয়া হইয়াছে। এখানে সেখানে পূর্ব দুই নিকায়ে উল্লেখিত বিষয় সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও এই নিকায়ে স্বর্গ, নরক, স্ত্রীচরিত্র, বুদ্ধের বিবিধ গুণ, উপাসক উপাসিকাদের কর্তব্যাকর্তব্য এবং সর্বোপরি পাক্-ভারতের ইতিকাহিনীর বহু দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা (ঙ) পঞ্চবল — শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতিসমাধি ও প্রজ্ঞা। (চ) সপ্তবোধ্যঙ্গ — স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা। (ছ) অষ্টমার্গাঙ্গ — সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, ও সম্যক-সমাধি। তবে কিনা চিত ও চৈতসিক হিসাবে বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যা চৌদ্দ। এই চৌদ্দটির মধ্যে বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতে উহারা সপ্তত্রিংশতে গিয়া দাঁড়ায়।

সংক্ষেপে দীর্ঘনিকায়ে প্রাক্-বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক রীতিনীতি নিয়া আলোচনা ও গবেষণা করা হইয়াছে।

ইহাতে দর্শন অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মজ্ঝিম নিকায় সমস্ত নিকায়ের মধ্যে প্রধান। কারণ ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় শীল ও বৌদ্ধ দর্শন। ইহা দীর্ঘনিকায়ের মত প্রাক্-বৌদ্ধ দর্শন নিয়া অতবেশী মাথা ঘামায় নাই। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায় দীর্ঘ, মজ্ঝিম নিকায় সমূহের বিস্তৃত ভাষ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

খুদ্দকনিকায় —খুদ্দকনিকায়ের অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট নয়। 'খুদ্দক' অর্থে আমাদের এখানে বুঝিতে হইবে অনেকগুলি গ্রন্থের সমষ্টি। খুদ্দকনিকায় অন্যান্য নিকায়ের চেয়ে আকারে বড়। কারণ ইহাতে ছোট-বড় ১৬টি গ্রন্থ আছে। যথা ঃ খুদ্দকপাঠো, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিবমানবর্থ, পেতবথু, থের-থেরীগাথা, জাতক, উদ্দেশ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক, নিদ্দেশ ও পটিসম্ভিদামার্গ। ইহার মধ্যে ধর্মপদ, জাতক ও সুত্তনিপাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ বইগুলিতে প্রাচীন পাক-ভারতের বহু তত্ব ও তথ্য নানাভাবে রক্ষিত আছে। থেরীগাথাতে প্রাচীন ভারতে মহিলা সম্প্রদায়ের বহু তথ্য নিহিত আছে। মহিলা সমাজের অপরূপ কাহিনী অন্য কোন গ্রন্থে এতবেশী পাওয়া যায় না।

অভিধর্মপিটক — আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি প্রথম দুই সঙ্গীতিতে অভিধর্মপিটকের কোন উল্লেখ নাই। অভিধর্মপিটকের রচনাকাল নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। ইহাতে ৭টি গ্রন্থ। যথা ঃ ধর্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, যমক, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, পটঠান ও কথাবথু প্রকরণ। ইহার মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ কথাবথু প্রকরণ নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ এই গ্রন্থটির রচনা হয় তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে তিস্স মোগগলিপুত্ত কর্তৃক। অথচ ইহা ত্রিপিটকের অন্তর্গত করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে ইহাতে নূতন কিছু যোগ করা হয় নাই। মূল ত্রিপিটকে যাহা ছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নয়। এই গ্রন্থটির এমন কতগুলি বিষয় আছে যাহা কিছুতেই অশোকের সমসাময়িক নয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই গ্রন্থের কিছুটা অংশ অশোকের সমসাময়িক, বাকী অংশ অশোকের পরে রচনা করিয়া মূল গ্রন্থের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেই অংশে 'শৈল,' 'বৈটুল্লক,' 'সঙ্কন্তিক,'

'হৈমবতিক,' 'উত্তরাপথক' প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পরের রচনা বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রাক্-অশোক যুগে ঐ নিকায়গুলির অস্তিত্ব অন্য কোথাও উল্লেখিত হয় নাই।

এই মূল ত্রিপিটক ছাড়াও পরবর্তীকালে পালিতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধভিক্ষু ও দার্শনিক বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) সমস্ত ত্রিপিটকের ভাষ্য লিখেন। তাঁহার রচিত বিশুদ্ধিমার্গের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন সিংহলী অর্থকথা হইতে পালিতে অনুবাদ করেন। তিনি যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হইল।

১. সামন্ত পাসাধিকা — বিনয় অটঠকথা।
২. সুমঙ্গল বিলাসিনী — দীঘনিকায় অটঠকথা।
৩. পপঞ্চ সুদনী — মজ্ঝিম নিকায় অটঠকথা।
৪. সারত্থ পকাসিনী — সংযুত্তনিকায় অটঠকথা।
৫. মনোরথ পুরণী — অঙ্গুত্তরনিকায় অটঠকথা।
৬. কঙ্কাবিতরণী — পাতিমোকখ অটঠকথা।
৭. অথসালিনী — ধম্মসঙ্গনি অটঠকথা।
৮. সমোহ বিনোদিনী — বিভঙ্গ অটঠকথা।
৯. পাটঠিনপ্পকরণ অটঠকথা
১০. পরমত্থযোথিকা — খুদ্দকপাটো ও সুভনিপান অটঠকথা।

ইহা ছাড়াও কথিত আছে যে বুদ্ধঘোষ ধম্মপদ ও জাতকের অর্থকথা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলে যাওয়ার আগে জ্ঞানোদয় নামক একটি বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। দক্ষিণ ভারতের অর্থকথাকার বুদ্ধদত্ত 'খুদ্দসিখা' ও 'মূলসিক্‌খা' নামক দুইখানা বিনয়ের গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়াও আরও বহুগ্রন্থ সিংহল, বর্মা ও ভারতে রচিত হয়। তারমধ্যে 'মিলিন্দ পঞ্‌হ,' 'মহাবংস,' 'দীপবংস,' 'চূলবংস,' 'গন্ধ বংস,' 'সাসন বংস,' 'বিসুদ্ধিমগ্‌গো,' 'পেটকোপদেস,' 'নেত্তিপকরণ' ইত্যাদি।

পালিভাষা ছাড়া সংস্কৃত ও আধা সংস্কৃত ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। তারমধ্যে হীনযান, মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি প্রধান।

সংস্কৃত ভাষায় 'বুদ্ধচরিত', 'অভিধর্মকোষ,' 'মাধ্যমিক কারিকা' 'বিংশিকা ও ত্রিংশিকা,' 'বোধি-চর্যাবতার,' 'শিক্খাসমুচ্চয়,' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের কিছু কিছু গ্রন্থ সংস্কৃত ও আধাসংস্কৃত ভাষায় আবিস্কৃত হইয়াছে। তারমধ্যে অভিধর্মপিটকের সাতটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেগুলির নাম ঃ সারীপুত্র বিরচিত 'ধর্মস্কন্ধ' ও 'সঙ্গীতি পর্যায়,' মৌৎগল্ল্যায়ণের 'প্রজ্ঞপ্তি-শাস্ত্র,' কাত্যায়ণের 'জ্ঞানপ্রস্থান সূত্র,' দেরক্ষেমের 'বিজ্ঞানকায়,' এবং বস্থমিত্রের 'প্রকরণপাদ'। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে 'বৈপুল্যসূত্র,' 'ললিত বিস্তর,' 'লঙ্কাবতার সূত্র,' 'সধর্মপুণ্ডরিক,' 'সুখাবতী-ব্যূহ', 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' প্রভৃতি প্রধান। উপরি উক্ত গ্রন্থের একাধিক চৈনিক অনুবাদ বর্তমান।

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিরাট ও বিস্তৃত। বড়ই পরিতাপের বিষয় এখনও পাক-ভারত উপমহাদেশে কোন পালিগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিব্বত, নেপাল, চীন, ভূটান, ব্রহ্ম, শ্যাম, কোরিয়া, জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও তুর্কিস্থানে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ নানা ভাবে আবিস্কৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনীষীদের চেষ্টায় এই গ্রন্থসমূহের পাঠোদ্ধার ও সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বহু গ্রন্থ ছাপানো হইয়াছে। ইহার কিছু কিছু ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে পালিতে রচিত গ্রন্থগুলি চমৎকার শব্দ যোজনায়, প্রকাশ ভঙ্গিতে এবং সর্বোপরি বাস্তবধর্মিতাগুণে বাংলা ভাষাকে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যেই বাংলা ভাষা পালিভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল সেই ভাষায় এখনও ত্রিপিটকের অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থ মাত্র বঙ্গাক্ষরে সংকলিত ও অনুদিত হইয়াছে।

। পালি সাহিত্যে জাতক ।

পালি সাহিত্যে রচিত 'জাতক' সমূহ শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বৌদ্ধদের মতে জাতক ভগবান বুদ্ধের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত। ভগবান বুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলি জাতকাকারে লিপিবদ্ধ। বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধ এক জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে বুদ্ধ হন নাই। বুদ্ধ হওয়ার

জন্ম তাঁহাকে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সাধনা ও আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছে। পালি সাহিত্যে [১৪] উল্লেখ আছে বুদ্ধ হইতে হইলে দশটা পারমী [১৫] তিন ভাবে [১৬] পূর্ণ করিতে হয়। এইগুলি পূর্ণ করিবার জন্য বুদ্ধাঙ্কুরকে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভগবান তথাগত তাঁহার নানা জন্মের পরস্পর সূত্রবদ্ধ জীবনে দশ পারমিতার অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। তিনি অতীত জীবনের কাহিনীগুলি তাঁহার শিষ্যদের কাছে ধর্মোপদেশ দিবার ছলে বলিতেন। ইহাতে ধর্মোপদেশগুলি শিষ্যদের কাছে অতীব মনোরম ও চমক্প্রদ হইত। শিষ্যেরা অতি সহজে ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। তিনি 'স্পন্দন,' 'দদ্দভ,' 'লটুকিক,' 'বৃক্ষধম্ম' ও 'সম্মোদমান' জাতক বলিয়া দুই বিবদমান জাতি শাক্য ও মৌলিয়দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। মহাধর্মপাল জাতক শুনাইয়া বুদ্ধ স্বীয় পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং চন্দকিন্নর (৪৮৫) জাতক বলিয়া রাহুলমাতাকে[১৭] তাঁহার পাতিব্রত্যধর্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সম্যক্ সম্বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে ভগবান তথাগত যখন পারমী পূর্ণ করিতে ছিলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর নামে পরিচিত হইতেন। জাতকার্থ-বর্ণনামতে এই অবস্থায় তিনি দশ পারমী, দশ উপপারমী, দশ পরমার্থ পারমী এবং লোকার্থচর্যা, জ্ঞাতিচর্যা, এবং বুদ্ধার্থ চর্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি কর্মফলে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, দেবতা, বণিক, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোক, চণ্ডাল, আবার কখনও হস্তী, অশ্ব, ময়ূর ও রাজহংস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিজন্মেই কোন না কোন পারমী পূর্ণ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পালিভাষার ক্রমবিকাশ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে জাতকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই জাতককে কেন্দ্র করিয়া এক সময় উত্তর ভারতে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিভাষার চর্চা ও গবেষণা হইয়াছিল। অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র উত্তর ভারতে পালিভাষা জনসাধারণের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। তখন মূল পালিকে অবিকৃত রাখার জন্য বহু সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। জাতকগুলি কে রচনা করিয়াছেন এই নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে

বহু তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। অনেকে মনে করেন বুদ্ধঘোষই জাতকের রচয়িতা। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন যুক্তি সংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতকের রচয়িতা বলিয়া আরও কয়েকজন সিংহলী পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। যেমন ভদন্ত রেবত, সংঘপাল, অত্তদর্শী, বুদ্ধমিত্র প্রভৃতি। এইগুলির দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বুদ্ধঘোষের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু আগেই ভারত ও সিংহলে জাতকের পঠন পাঠন বর্তমান ছিল। তবে এটা সত্য যে জাতকের রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধঘোষের নামের গুরুত্ব দেওয়া না হইলেও তাঁহার দ্বারাই পালিভাষা ও জাতকের গুরুত্ব সিংহলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় পরবর্তী কালে ভাষ্যকারগণ জাতকত্থবন্ননার রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধঘোষের নাম ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এখনও আমাদের দেশে বহু লোকের বিশ্বাস যে মহাভারত ও রামায়ণের রচয়িতা কাশীরাম ও কৃত্তিবাস। কারণ এই দুইজন লোকই রামায়ণ-মহাভারতের পঠন ও পাঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একই কারণেই বোধ হয় বুদ্ধঘোষের নামও জাতক রচনার সহিত জড়িত।

প্রত্যেক জাতকের তিনটি ভাগ। প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, অতীত বস্তু ও সমাধান। বর্তমানের ঘটনাকে প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা "পচ্চুপ্পন্নবত্থু" বলে। ভগবান বুদ্ধ গল্পটি কোথায়[১৮], কাহাঁকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন এবং তখনকার স্থান, কাল পাত্র সম্পর্কে যে ঘটনার সমাবেশ তাহাই প্রত্যুৎপন্নবস্তু। ইহাকে জাতকের উপক্রমণিকা বা ভূমিকা বলা যায়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ মূল জাতকটির অবতারণা করেন। এই মূল জাতকটিই অতীত বস্তু বা অতীত বত্থু নামে আখ্যাত। এই অংশে বুদ্ধ তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতীত জীবনের সহিত বর্তমান জীবনের যে সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ অতীতের বোধিসত্ত্বই বর্তমানের বুদ্ধ। অতীত জীবনের পাত্রাপাত্রের সহিত বর্তমান জীবনের পাত্রাপাত্রের সম্পর্ক স্থাপন সমোধান বা সমাধান।

জাতকবর্ণনায় ৩৭২টি জাতকে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের উল্লেখ আছে। এই বারানসীরাজ কে এই নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার আলোচনা

হইয়াছে। কেহ মনে করেন ইহা গল্প আরম্ভ করিবার একটা পদ্ধতি মাত্র। পাশ্চাত্য কথাকারেরা যেমন 'once upon a time' দিয়া মামুলি ভাবে গল্প আরম্ভ করেন জাতক রচয়িতারাও সেই ভাবে জাতকের ভণিতা করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মদত্ত কাহারও কল্পিত নাম নয়। সত্য সত্যই ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মদত্ত কাহারও নাম নয়। ইহা একটি রাজবংশের উপাধি। এই বংশে যতরাজা জন্মিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকরই উপাধি ছিল ব্রহ্মদত্ত এবং রাজধানী ছিল বারানসীতে। বর্তমানে ইংলণ্ডের রাজার উপাধি যেমন 'জর্জ,' 'এডোয়ার্ড' প্রভৃতি এবং জাপানের 'মির্কাডো' সেইরূপ ব্রহ্মদত্তও একটা উপাধি বিশেষ। তবে এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা পণ্ডিতদের বিচার্য।

ইহার মধ্য থেকেই বুঝা যায় যে বৌদ্ধেরা জন্মান্তরবাদের সমর্থক। অথচ তাঁহারা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মানুষ কর্মফলে জন্মান্তর গ্রহণ করে। মানুষের দেহ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নিয়েই গঠিত। এদের সমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই এই পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধিত হয়। কর্মফলে আবার নুতন পঞ্চস্কন্ধ গঠিত হয়। পুরাতন পঞ্চস্কন্ধের সহিত নুতন পঞ্চস্কন্ধের সম্পর্ক কেবল কর্মের মাধ্যমেই হয়। তৃষ্ণার কারণেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়। তৃষ্ণার নিরোধেই পুনর্জন্মের নিরোধ। জন্মের কারণ "ভবের কারণে জন্ম, উপাদানের কারণে ভব। ভবের কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান। বেদনার কারণে তৃষ্ণা, স্পর্শের কারণে বেদনা। ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ। নাম-রূপ। বা পঞ্চস্কন্ধের কারণে ষড়ায়তন বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, অবিদ্যার কারণে সংস্কার। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে অবিদ্যার কারণে সংস্কার। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণেই মানুষ জন্মান্তর গ্রহণ করে। বার বার জন্মগ্রহণ করাটাই দুঃখ। কারণ সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেই জরা, ব্যাধি, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ, ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইতে হইলে দানশীল ও ধ্যানাভ্যাসের দরকার। ধ্যানানুশীলনের দ্বারা মানুষ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মানুষ পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়।[১৯] এই জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ বুঝিতে পারে যে তৃষ্ণার কারণেই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মগ্রহণ করিয়াই পুঞ্জীভূত দুঃখভোগ করিতেছে। এই দুঃখের চির অবসান করিতে হইলে তৃষ্ণার নিরোধ অবশ্যম্ভাবী তৃষ্ণার নিরোধেই সমস্ত উপসর্গের নিরোধ। অতএব দুঃখের সম্যক উপলব্ধিই দুঃখ বিনাশের হেতু। অষ্টাঙ্গিক মার্গের[২০] অনুশীলনই দুঃখমুক্তির উপায়। দুঃখের বিনাশই নির্বাণ। জাতক সমূহে বুদ্ধ এই নির্বাণের মাহাত্মই বর্ণনা করিয়াছেন। নিজে কি করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই লোকের কাছে উদাহরণ স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

মূলজাতক বা অতীতবস্তু পদ্যে ও গদ্যে লিখিত। পণ্ডিতদের মতে পদ্যাংশটি (গাথা) অপেক্ষাকৃত পুরানো এবং ইহা জাতকের প্রাণ স্বরূপ। গল্পের সারাংশ সাধারণতঃ গাথা আকারে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। গদ্যাংশ সম্ভবতঃ পরে জাতকের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। গাথাগুলিকে অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলে। গাথাগুলির নীচে এক প্রকারের অর্থকথা বা ব্যাখ্যা আছে। উহাকে পালি সাহিত্যে বেয্যাকরণ বলে। গাথার সংখ্যানুসারে জাতকের গল্পসমূহকে ২২ নিপাতে ভাগ করা হয়। প্রথম নিপাতে একটা গাথা সমন্বিত ১৫০ টি জাতক আছে। দুইটি শ্লোকের এক শতটি। তিনটি শ্লোকের পঞ্চাশটি এবং এই ভাবে সমস্ত জাতক গুলিকে ২২ অধ্যায়ে ভাগ করা হয়।

প্রত্যেক অধ্যায়ে গাথার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সংখ্যা কমিয়া যায়। জাতকার্থ বর্ণনা মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ তবে আসল জাতকের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। কারণ জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলি সমগ্র জাতক নহে। সুত্তপিটকে এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশে কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতকও পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ জাতকের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। জাতকের গল্পগুলি আখ্যায়িকার সামিল। সুবিধা মত ইচ্ছা করিলে বোধিসত্তকে নায়কের পর্যায়ে ফেলিয়া প্রচলিত আখ্যানকে বৌদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া জাতকরূপে চালাইয়া দেওয়া যায়। সেইদিক দিয়া ইহাকে আরব্য উপন্যাসের সহিত সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে। তিব্বতে

এবং সিংহলে এই রকম বহু জাতক রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। জাতকের সংখ্যা গণনা না করিয়া ইহাকে যদি উপাখ্যান হিসাবে ধরি তবে এই উপাখ্যানের সংখ্যা দাঁড়াইবে তিন হাজারের উপর। কেবল মাত্র মহাউন্মার্গ জাতকেই শতাধিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই হিসাবে জাতকের গল্প পৃথিবীর যে কোন প্রকাণ্ড গ্রন্থের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জাতক সম্পর্কে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কেবল তাহা নহে, পরে প্রদর্শিত হইবে যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।"[২১]

জাতকের প্রাচীনত্ব নিয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। পণ্ডিতদের মতে সুত্ত ও বিনয় পিটক রচনার পরেই জাতকের সংকলন হয়। বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজগৃহের প্রথম সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সংকলন হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে বৈশালীর মহাসঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সংকলন হয়। তাই যদি হয় তবে জাতকের রচনাকাল দাঁড়ায় খ্রীস্টজন্মের ৩৭০ বৎসর পূর্বে। জাতকের তুলনায় বৃহৎকথা, কথা সরিৎ সাগর ও পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি মাত্র সেদিনকার। ইহা ছাড়াও জাতকের গল্পগুলি অনুধাবন করিলে ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে কতকগুলি জাতক, যেমন অপন্নক, ন্যাগ্রোধমৃগ, লোশক, খদিরাঙ্গর প্রভৃতি বুদ্ধের সমকালেই রচিত হইয়াছিল। কারণ ইহার মধ্যে বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুট যে ইহা বুদ্ধের সমকালীন না হইয়া পারে না। অনেকে আবার তর্ক করেন রামায়ণ-মহাভারত জাতকের চেয়েও প্রাচীন। অতএব বৌদ্ধ লেখকেরা উহার থেকে অপহরণ করিয়া নিজেদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা দুস্কর। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে জাতকগুলির ধরণ রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের চেয়ে অমার্জিত, অসংস্কৃত এবং কাব্যোৎকর্ষ বর্জিত। পক্ষান্তরে পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ, বর্ণনা-চাতুর্যে, ভাবমাধুর্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে অদ্বিতীয়। এতে প্রমাণ হয় যে জাতকের আখ্যানগুলি ইহাদের বহু আগে রচিত হইয়াছিল। বারহুত[২২] শিলালিপিতেও (২০০ B.C.) বহু জাতকের চিত্র[২৩] উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারুতের

নির্মাণকার্য খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্পন্ন হইয়াছিল। কাজেই উল্লিখিত জাতক সমূহের সৃষ্টি ইহার বহু আগে সংকলিত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। অশোকের সময়েও বহু জাতকের পঠন ও পাঠন হইত।

। জাতকের বিশেষত্ব ।

অন্যান্য সংস্কৃত গল্পের চেয়ে জাতকের গল্পগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। ইহা মুখ্যত ধর্মীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া রচিত হইলেও ইহার মধ্যে ধর্মিতাগুণ অনেক বেশী। ইহার মধ্যে উদাসীন ও নির্লিপ্ত তপোবনের কথা আছে বটে, কিন্তু সেই তপোবন শান্তরসাম্পদ গ্রামের গণ্ডী হইতে দূরে নয়। তাই সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লোভ-হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বিবিধ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা ব্যতিব্যস্ত না হইয়া পারে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গ্রাম থেকে দূরে বিহারে ও মঠে বাস করিলেও প্রতিদিন গ্রাম ও নগরে ভিক্ষার জন্য আসিতেন। তাহাতে তাঁহারা মানুষের আপামর জনসাধারণের দৈনিন্দন সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত হইতেন। তাহাদের দুঃখ সুখের অংশিদার হইতেন। রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখিতেন। কোন কোন স্থানে সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন। কেবল তাহা নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংসার ত্যাগী বৈরাগ্য ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করিলেও তাহাদের মধ্যে নানা দোষ ভণ্ডামী, শীলা পালনে ঔদাসীন্য প্রভৃতি ভুল ভ্রান্তির ছবি জাতকের গল্পে সুস্পষ্ট। তাঁহারাও সাংসারিক লোকের মত সাধারণ জিনিষ নিয়া নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, পরস্পর পরস্পরের দোষারোপ প্রভৃতি কর্মের বশীভূত হইতেন। এইরকম নিরহঙ্কার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক সাহিত্যে বিরল।

জাতকের প্রধান বিশেষত্ব হিতোপদেশ দেওয়া নয়। গল্প বলাটাই প্রধান। সমসাময়িক সাহিত্যের মত ইহাতে অতিপ্রাকৃত অতি রঞ্জনের ছাপ অত বেশী সুস্পষ্ট নয়। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের গল্পের মত ইহাতে পশু চরিত্রে অ-বাস্তবতা আরোপ করার চেষ্টা নাই। পশু চরিত্রের যাহা বিশেষত্ব তাহাই এখানে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতক এই দিক্ দিয়া বেশ উপভোগ্য।

বৌদ্ধ জাতকের আর একটা বিশেষত্ব হইল গল্পের নায়ক বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুরকে কোথাও অতিমানব রূপে চিত্রিত করিবার কোন তাগিদ নাই। তিনি একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের দোষগুণ তাঁহার চরিত্রে বর্তমান। সাধারণ মানুষের মতই বোধিসত্ত্ব সূত্রধর, শুঁড়ী, নাপিত, চর্মকার, শ্রেষ্ঠী, বণিক, তক্ষণশিল্পী, স্বর্ণকার, পাচক, পশু পালক, এমনকি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার হইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৪] এতৎ সত্ত্বেও বৌদ্ধ লেখকেরা কোথাও কোথাও বুদ্ধ চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা সমসাময়িক সাহিত্যেকদের মত ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার চরিত্র বর্ণনাতে বাস্তবতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পরিমিতি বোধকে বিস্মৃত হইয়া যাননি। একদিক দিয়া পালি জাতক সমূহ সরল বর্ণনা মাধুর্যে, সহজ ভাষায় ও প্রসাদগুণে বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ।

| বিদেশী সাহিত্যে পালি জাতকের প্রভাব |

বিদেশী সাহিত্যে জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। খ্রীস্টজন্মের বহুপূর্বে গ্রীক্‌দেশের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। কথিত আছে গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দরায়ুসের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি এখান থেকে ভারতীয় দর্শন ও জ্যামিতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। দরায়ুস পাঞ্জাবের কিছুটা অংশ দখল করিয়াছিলেন। তার আগেও পারস্য রাজসভায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গ্রীক্‌দার্শনিকদের আনাগোনা ছিল। এই সময় কিছু সংখ্যক জাতকের গল্প যে গ্রীস দেশে যায় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কারণ ডেমোক্রিটাস ও প্লেটোর[২৫] গল্পে জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীকের সহিত পাক-ভারত সম্পর্ক আরও মধুর হয়। পাশ্চাত্যদেশের সহিত পাক-ভারতের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ প্রকট হয়। এই সময়ও বহু জাতকের গল্প প্রতীচ্য দেশে বিস্তার-লাভ করে। তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে অশোক বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতকে এই সমস্ত দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মপ্রচারের ছলে বহু জাতকের কাহিনী এতদ্দেশে প্রচার করেন। ইহুদিদের মধ্যে বহু জাতকের কাহিনী প্রচলিত আছে।[২৬]

মহাউম্মার্গ জাতকের বিচার কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের সলোমনের বিচার পদ্ধতির বহুস্থানে মিল আছে। পণ্ডিত হোইডোজের মতে এই গল্পটি ভারতীয় সূত্রেই রোমে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। "ইলিস জাতক" ও "মথির সুসমাচার" প্রায় এক রকম। দুইটি গল্পে দেখা যায় যথাক্রমে ভগবান বুদ্ধ ও প্রভু যীশু অল্প খাদ্যে বহু লোকের ক্ষুধা মিটাইয়া ছিলেন।

মধ্য প্রাচ্যে ইসলামের আবির্ভাবের বহু আগে তদানীন্তন সাহিত্যে বৌদ্ধ জাতকের প্রভাব অতীব সুস্পষ্ট। ইটালীয় পণ্ডিত কম্পারেত্তির মতে সিন্দবাদের আদি পুরুষ মিত্রবিন্দই ছিলেন জাতকে বর্ণিত মিত্তবিন্দক। নিগ্রো সাহিত্যের মধ্যেও জাতকের প্রভাব দেখা যায়। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় প্রচলিত রিমাস কাফার গল্পের সহিত পঞ্চায়ুধ জাতকের হুবহু মিল আছে। আধুনিক কালে প্রচলিত বহু গ্রীসের গল্পের সহিত জাতকের মিল পরিলক্ষিত হয়। চিত্র দ্বারা কাহিনীর ব্যাখ্যা পূর্বে ইউরোপে প্রচলিত ছিল না। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপে বাসীরা গল্প প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে।

॥ নির্দেশিকা ॥

১. অভিধান প্রদীপিকা, পৃঃ ৫৩৯

২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড (ভূমিকা)

৩. পালি প্রকাশ — Introduction.

৪. পালি ভাষার কাল নির্ণয় (Palibhasaca Kalanirnaya) বিবিধ Jnanavicara, P. 41, 139 C/o Childer's Pali Dictionary, Introduction. Dictionary of the Pali Language, — Childer's, P. 322.

৫. O. Franke : Pali and Sanskrit, PP. 131—132.

৬. E. Windisch's ; "Utter den Sprachlichen Charakter Des·Pali", P. 23 ff.

৭. Grierson : Home of Literary Pali, P. 117. (Bhanderker Commemoration Volume).

৮. The Language of the Bhabru Edict.

৯. Cullavagga, V. 33.

১০. চুল্লবগ্‌গ, X—X11.

১১. দীঘনিকায়

১২. চুল্লবগ্‌গে উল্লেখ আছে যে সঙ্গায়নের প্রধান কারণ বর্জী ভিক্ষুদের দশটি বিনয়ের নিয়ম (দসবত্থূনী) লঙ্ঘন।

১৩. সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম, যথাঃ (ক) চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান — কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ও ধর্মানুদর্শন। (খ) চতুর্বিধ সম্যক প্রধান — (১) উৎপন্ন পাপচিত্তের দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা, (২) অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা (৩) অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের চেষ্টা ও (৪) উৎপন্ন কুশল পরিবর্ধনের চেষ্টা। (গ) চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ — ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা। (ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। (ঙ) পঞ্চবল — শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। (চ) সপ্তবোধ্যঙ্গ — স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা। (ছ) অষ্টমার্গাঙ্গ — সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, ও সম্যক-সমাধি। তবে কিনা চিত্ত ও চৈতসিক হিসাবে বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যা চৌদ্দ।

এই চৌদ্দটির মধ্যে বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতে উহারা সপ্ত ত্রিংশতে গিয়া দাঁড়ায়।

১৪. জাতকত্থবন্না, পৃ: ১—৯৪

১৫. দশপ্পরমী যথা: দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা।

১৬. দশপারমী, দশ উপপারমী, দশ পরমার্থ পারমী। পারমী শব্দের প্রকৃত অর্থ পূর্ণতা বা perfectionary virtues.

১৭. তিনি গৌতমের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র ছেলের নাম রাহুল বলিয়া তাঁহাকে রাহুল মাতা বলা হইত। তাঁহার প্রকৃত নাম যশোধরা। সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধ হইয়া কপিলাবস্তুতে পদার্পণ করিলে রাহুলমাতা তাঁহার ছেলে ৭ বৎসরের রাহুলকে পিতার 'দায়াদ' শাক্যরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। বুদ্ধ রাহুলকে রাজ্যের পরিবর্তে প্রবজ্যাদান করিয়াছিলেন। রাহুলমাতা পরবর্তীকালে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সহিত ভিক্ষুণীব্রতগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীদের অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন।

১৮. কতটি জাতক কোথায় বলা হইয়াছিল উহার একটি লিষ্ট এখানে দেওয়া গেল। জেতবন বিহারে ৪১০টি জাতক, বেনুবনে ৪৯, শ্রাবস্তীতে -৬, রাজগৃহে -৫, কৌসাম্বীতে -৫, কপিলাবস্তুতে -৪, বৈশালীতে -৪, আলবীতে -৩, কুণ্ডলদহে -৩, কুশীনগরে -২, মগধে -২, লটিঠবনে -১, দক্ষিণ গিরিতে -১, মৃগদাবে -১, মিথিলাতে -১, এবং গঙ্গাতীরে -১। এইভাবে জাতকের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বশুদ্ধ ৪৯৮টি। বাকীগুলি সম্ভবতঃ পরে সংযুক্ত হইয়াছে।

১৯. "যোগা বে জায়তী ভূরী অযোগা ভূরিসংখয়ো;
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায় বিভবায় চ;
তথত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরী পবড়ঢতী।" — ধম্মপদং -২৮৩

২০. অষ্টাঙ্গিক মর্তা, যথা; সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক কর্ম, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি।

২১. জাতক, ১ম খণ্ড, Introduction.

২২. বারহুত মধ্যপ্রদেশের সাতনা ষ্টেশনে অনতি দূরে অবস্থিত। ভারুতও সাঁচী পাটলিপুত্র হইতে উজ্জয়িনী যাইবার পথে পড়ে। এই দুইটি স্থান মহিন্দের জন্মস্থান 'বিদিসা' হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

২৩. ভারুত স্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলি চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। মখাদেব (৭), ন্যাগ্রোধমৃগ (১২), নৃত্য জাতক, আরাম—দুষক (৪৬) অম্বভূত (৬২), দুভিয়ক্কট (১৭৪), অসদৃশ (১৮১). কুরঙ্গমৃগ (১০৬), কর্কট (২৬৭), সুজাত (১৫২), কুক্কট (১৮৩), মৃগকথ (৫৩৮), লটকিক (৩১৬), দশরথ (৪৬১), চন্দকিন্নর (৪৮৫), ষড্‌দন্ত (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গ (৫২৩), বিধুর (৫১৫), মহাজন (৫৩৯)।

২৪. কতবার বোধিসত্ত্ব কি ভারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহার একটা তালিকা নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

রাজা -৪৫টী জাতকে, ঋষি -৮৩, বৃক্ষদেবতা -৪৩, আচার্য -২৬, অমাত্য -২৪, ব্রাহ্মণ -২৪, রাজপুত্র -২৪, ভূম্যাধিকারী -২৩, পণ্ডিত -২২. ইন্দ্র -২০, বানর -১৮, শ্রেষ্ঠী -১৩, ধনী -১২, মৃগ -১১, সিংহ, - ? রাজহংস ? -৮, বর্তক -৬, হস্তী—? কুক্কট -৫, দাস -৫, গৃধ -৫, অশ্ব -৪, গো -৪, ব্রহ্মা -৪, ময়ূর —? সর্প -৪, কুম্ভকার -৩, নীচজাতীয় লোক -৩, গোধা -৩, মৎস -২, গজচালক -২, মূষিক -২, মূষিক •২, শৃগাল -২, কাক -২, কাষ্ট কুট্টক -২, চোর -২, শূকর -২, এবং কুকুর -১, বিষবৈদ্য, ধূর্ত, কর্মকার, বর্ধকী একবার করিয়া। এইরূপ গণনায় ১৩০ জাতকের নাম পাওয়া যায়।

২৫. কুকুর ও তার প্রতিবিম্ব = চুল্ল ধনুগ্‌গহ জাতক।
সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ = সিংহচর্ম জাতক।

২৬. নিম্নে কয়েকটি 'ঈশপ' আখ্যানের সহিত জাতকের তুলনা করা হইল :

নৃত্য জাতক (৩২) = The Jay and Peacock.

মশক (৪৪) = The Boldman the Fly.

সুবর্ণহংস (১৩৬) = The Goose with Golden Eggs.

মূনি জাতক (৩০) = The Ox and the Calf.

সিংচর্ম জাতক (১৮৯) = The Ass and the Lion Skin.

কচ্ছপ জাতক (২১৫) = The Eagle and Tortoise.

জম্বু জাতক (২৯৪) = The Crow and the Fox.

জবশকুণ জাতক (৩০৮) = The Wolf and the crane.

চুল্ল ধনুগগহ জাতক (৩৭৪) = The Dog and Shadow.

কুক্কুট জাতক (৩৮৩) = The Fox, Cocks and Dog,

দ্বীপি জাতক (৪২৬) = The Wolf and the Lamb.

এইরকম আরও বহু গল্পের সহিত ঈশপ রচিত আখ্যানগুলির মিল আছে।